icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

স্বাস্থ্য সংলাপ

ISSN 1021-2078

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ১৮ ■ সংখ্যা ৩ ■ চৈত্র ১৪১৬ ■ এপ্রিল ২০১০

স্বাস্থ্য সংলাপ-এর বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত

আইসিডিডিআর,বি হাসপাতালে ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা-ব্যবস্থায় অনুসৃত ধারাক্রম

তাহমিদ আহমেদ, এনএইচ আলম, আজহারুল ইসলাম, এম শাহাদাত হোসেন, হাসান আশরাফ, এম ইকবাল হোসেন, মুনিরুল ইসলাম, এএম শামসির আহমেদ, ওয়াসিফ এ খান, এএসজি ফারুক, এমএ সালাম, আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো

আইসিডিডিআর,বি

[কলেরাসহ সব ধরনের ডায়রিয়া রোগের চিকিৎসায় আইসিডিডিআর,বি-র বিশেষ দক্ষতা এখন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। ঢাকা নগরীর মহাখালিতে এবং চাঁদপুর জেলার মতলবে কেন্দ্রের যে-দু'টি হাসপাতাল রয়েছে এখানে মুমূর্ষু অবস্থায়ও কোনো রোগীকে নিয়ে আসলে অন্তত ডায়রিয়ার কারণে তার মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না। দীর্ঘ দিনের গবেষণায় ও অনুশীলনে আইসিডিডিআর,বি এই দক্ষতা অর্জন করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কলেরা মহামারী দেখা দিলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডাকে সাড়া দিয়ে আইসিডিডিআর,বি বিশেষজ্ঞ দল পাঠায়। ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ক্ষেত্রে আইসিডিডিআর,বি-র এই বিশেষ ব্যবস্থাপনা-কৌশল জানতে অনেকেই আগ্রহী। তাই প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী এখানে প্রশিক্ষণের জন্য আসছেন। ডায়রিয়াজাতীয় রোগ-ব্যবস্থাপনায় আইসিডিডিআর,বি-র কৌশল সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণ, বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর্মীদের ধারণা দেওয়ার মানসে আমরা এর মৌলিক দিকগুলো তুলে ধরছি। আশা করা যাচ্ছে: এই পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের ফলে অন্যান্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুহার বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে]

ডায়রিয়া রোগী

→ অন্য কোনো রোগ আছে কি না তা খতিয়ে দেখা[১]

→ মলে রক্ত/আম-এর উপস্থিতি আছে কি না তা দেখা[২]

পানিশূন্যতা নিরীক্ষণ

[১]ডায়রিয়ার সঙ্গে পর্যবেক্ষণকৃত অন্যান্য স্বাস্থ্যসমস্যার মধ্যে রয়েছে: নিউমোনিয়া, অপুষ্টি, দীর্ঘ-মেয়াদী ডায়রিয়া, যক্ষা, রক্তে জীবাণুর সংক্রমণ, মেনিনজাইটিস, হৃৎস্পন্দনে সমস্যা, জন্ডিস এবং শরীরে খনিজ পদার্থের অস্বাভাবিক ভারসাম্যহীনতা। এসব রোগ ও সমস্যা সনাক্ত করে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: মারাত্মক অপুষ্টির ব্যবস্থাপনার জন্য এবং যক্ষার চিকিৎসার জন্য জাতীয় নীতিমালা রয়েছে

[২]রক্ত-আমাশয় থাকলে যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে

রোগীর পেটের চামড়া টেনে ছেড়ে দিলে স্থিত হতে কত সময় নেয় তা দিয়ে পানিশূন্যতার তীব্রতা বোঝা যায়

ব্যবস্থাপনা

পানিশূন্যতা পূরণ

(ক) যদি পানিশূন্যতার কোনো লক্ষণ না-থাকে

দুই থেকে চার ঘন্টা পর্যবেক্ষণের পর খাবার স্যালাইনের প্যাকেট দিয়ে রোগীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রোগীর মা কিংবা সাথে-আসা লোককে খাবার স্যালাইন খাওয়ানো এবং স্বাভাবিক খাবার চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। নিচে উল্লেখিত মাত্রায় খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে–এই মর্মে রোগীর সেবাযত্নকারীকে অবহিত করা হয়:

- রোগীর বয়স দুই বছরের কম হলে: প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ৫০ থেকে ১০০ মিলিলিটার

ভেতরের পাতায়

আইসিডিডিআর,বি-তে ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্প ৪

জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব ৬

স্বাস্থ্যসমস্যায় তুলসীর উপকারিতা ৮

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস্, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	এম শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক	এম এ রহিম

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান ও রুবহানা রকিব

পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান
কম্পোজ	হামিদা আক্তার

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: নিজাম প্রিন্টার্স অ্যান্ড প্যাকেজেস, ঢাকা

পানিশূন্যতার মাত্রা নিরূপণ (ঢাকা-পদ্ধতি)[৩]

রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ	অবস্থা	স্বাভাবিক	অস্বস্থিকর/কম ক্রিয়াশীল*	অতি দুর্বল/অচেতন*
-	চোখ	স্বাভাবিক	বসে-যাওয়া	-
-	জিহ্বা	স্বাভাবিক	শুষ্ক	-
-	পিপাসা	স্বাভাবিক	পিপাসার্ত (সাগ্রহে পান করে)	পান করতে অসমর্থ*
-	চামড়ার শিথিলতা	স্বাভাবিক	টেনে ছেড়ে দিলে ধীরে স্থিত হয়*	-
-	নাড়ির স্পন্দন	স্বাভাবিক	স্বাভাবিকের চেয়ে ক্ষীণভাবে অনুভূত হয়*	গণনা সম্ভব নয় কিংবা অনুভূত হয় না
রোগের ধরন নির্ণয়	-	পানিশূন্যতার কোনো লক্ষণ নেই	তারকা (*)-চিহ্নিত লক্ষণগুলোর একটিসহ দু'টি লক্ষণ থাকলে সিদ্ধান্ত **স্বল্পমাত্রার পানিশূন্যতা রয়েছে**	স্বল্পমাত্রার পানিশূন্যতাসহ তারকা (*)-চিহ্নিত লক্ষণগুলোর অন্য একটি থাকলে সিদ্ধান্ত **মারাত্মক পানিশূন্যতা রয়েছে**
চিকিৎসার মূলসূত্র	• পানিশূন্যতা রোধ • কিছুক্ষণ পর পর পানিশূন্যতার মাত্রা নিরূপণ	-	• খাবার স্যালাইন দিয়ে পানিশূন্যতা পূরণ • ঘন ঘন পানিশূন্যতার মাত্রা নিরূপণ	• শিরায় স্যালাইন প্রয়োগ করে এবং একই সঙ্গে খাবার স্যালাইন দিয়ে পানিশূন্যতা পূরণ • খুব ঘন ঘন পানিশূন্যতার মাত্রা নিরূপণ

[৩]আলম ও অন্যান্য ॥ মডিফাইড ডব্লিউএইচও গাইডলাইনস্ ॥ পেডিয়্যাট্রিক ড্রাগস ২০০৩

- রোগীর বয়স দুই থেকে ৯ বছর হলে: প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ১০০ থেকে ২০০ মিলিলিটার
- রোগীর বয়স ১০ বছর বা তার বেশি হলে: যতবার যত খুশি খাবার স্যালাইন খাওয়া যাবে

কলেরায় আক্রান্ত রোগীর মল

রক্ত-আমাশয়ে আক্রান্ত রোগীর মল

(খ) যদি স্বল্পমাত্রার পানিশূন্যতার লক্ষণ থাকে

রোগীর শরীরের প্রতিকেজি ওজনের জন্য ৭৫ মিলিলিটার হারে প্রায় চার ঘণ্টা খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। রোগীকে সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর বয়সভিত্তিক মাত্রা নিম্নরূপ:

- রোগীর বয়স চার মাসের কম হলে: চার ঘণ্টায়
  ২০০ থেকে ৪০০ মিলিলিটার
- রোগীর বয়স ৪ থেকে ১১ মাস হলে: চার ঘণ্টায়
  ৪০০ থেকে ৬০০ মিলিলিটার
- রোগীর বয়স ১১ থেকে ২৩ মাস হলে: চার ঘণ্টায়
  ৬০০ থেকে ৮০০ মিলিলিটার
- রোগীর বয়স ২ থেকে ৪ বছর হলে: চার ঘণ্টায়
  ৮০০ থেকে ১,২০০ মিলিলিটার
- রোগীর বয়স ৫ থেকে ১৪ বছর হলে: চার ঘণ্টায়
  ১,২০০ থেকে ২,২০০ মিলিলিটার
- রোগীর বয়স ১৫ বছর বা তার বেশি হলে: চার ঘণ্টায়
  ২.২০০ থেকে ৪,০০০ মিলিলিটার

খাবার স্যালাইন দেওয়ার আগে সদ্য-আগত নিস্তেজ এক শিশুরোগী

খাবার স্যালাইন শুরু করার ১ ঘণ্টা পর অনেকটা সতেজ

খাবার স্যালাইন শুরু করার ৪ ঘণ্টা পর প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় মায়ের কোলে

- কিছুক্ষণ পর পর পানিশূন্যতার মাত্রা নিরূপণ করতে হবে
- অনেক রোগীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র খাবার স্যালাইনই আরোগ্যের জন্য যথেষ্ট
- যেসব রোগীর ঘন ঘন বমি হয় (প্রতিঘণ্টায় ৩ বারের বেশি) এবং পানিশূন্যতা বিদ্যমান থাকে তাদের ক্ষেত্রে শিরায় স্যালাইন প্রয়োগের কথা বিবেচনা করা যায়
- মারাত্মক পানিশূন্যতা দেখা দিলে শিরায় স্যালাইন প্রয়োগ করতে হবে
- মায়ের দুধসহ অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার চালিয়ে যেতে হবে

(গ) যদি মারাত্মক পানিশূন্যতার লক্ষণ থাকে

অবিলম্বে শিরায় স্যালাইন প্রয়োগ শুরু করতে হবে (রোগীর শরীরের প্রতিকেজি ওজনের জন্য ১০০ মিলিলিটার হিসেবে)

- রোগীর বয়স এক বছরের কম হলে প্রথম ঘণ্টায় প্রতিকেজি ওজনের জন্য ৩০ মিলিলিটার
- পরবর্তী ৫ ঘণ্টায় প্রতিকেজি ওজনের জন্য ৭০ মিলিলিটার
- এক বছরের বেশি বয়সের শিশু এবং বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে প্রথম ৩০ মিনিটে প্রতিকেজি ওজনের জন্য ৩০ মিলিলিটার
- পরবর্তী আড়াই ঘণ্টায় প্রতিকেজি ওজনের জন্য ৭০ মিলিলিটার

- রোগী যখনই গিলতে সমর্থ হবে তখনই তাকে খাবার স্যালাইন খেতে উৎসাহিত করতে হবে
- মারাত্মক পানিশূন্যতার ব্যবস্থাপনায় কলেরা স্যালাইন প্রয়োগই যথার্থ পন্থা

আরোগ্য লাভের আগে পর্যন্ত যে-চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে

খাবার স্যালাইন চালিয়ে যাওয়াই এ-পর্যায়ে সমীচীন প্রতিবার পাতলা/জলীয় পায়খানার পর নিচের নিয়মে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে:

- দুই বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: শরীরের প্রতিকেজি ওজনের জন্য ৫০ থেকে ১০০ মিলিলিটার
- বড় শিশুদের ক্ষেত্রে: শরীরের প্রতিকেজি ওজনের জন্য ১০০ থেকে ২০০ মিলিলিটার
- বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে: যতবার যত খুশি খাবার স্যালাইন খাওয়া যেতে পারে

অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা

যদি মনে হয় রোগী কলেরায় আক্রান্ত (চাল-ধোয়া পানির মত দেখায় এধরনের প্রচুর পরিমাণে পায়খানা হয়; দ্রুত পানিশূন্যতা দেখা দেয়; একই এলাকায় অনেক লোক একসঙ্গে আক্রান্ত হয়), তবে নিচের নিয়মে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে:

- শিশুদের ক্ষেত্রে: শরীরের প্রতিকেজি ওজনের জন্য ২০ মিলিগ্রাম অ্যাজিথ্রোমাইসিন একডোজে খেতে হবে
- বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে: ১ গ্রাম অ্যাজিথ্রোমাইসিন একডোজে খেতে হবে

যদি মনে হয় রোগী রক্ত-আমাশয় (শিগেলোসিস)-আক্রান্ত (পায়খানায় রক্ত এবং আম-এর অস্তিত্ব, মলত্যাগজনিত কষ্ট, ইত্যাদির সঙ্গে জ্বর) তবে নিচের নিয়মে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে:

- শিশুদের ক্ষেত্রে: শরীরের প্রতিকেজি ওজনের জন্য ১০ মিলিগ্রাম সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ১২ ঘণ্টা পর পর ৩ দিন খাওয়াতে হবে
- ৬ মাসের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে: শরীরের প্রতিকেজি ওজনের জন্য ১০ মিলিগ্রাম অ্যাজিথ্রোমাইসিন দৈনিক একবার করে ৫ দিন খেতে দেওয়া যেতে পারে
- বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে: ১২ ঘণ্টা পর পর ৫০০ মিলিগ্রাম করে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ৩ দিন খেতে হবে

সাধারণ আমাশয় (অ্যামিবিয়োসিস)-এর জন্য

শিশুদের ক্ষেত্রে: শরীরের প্রতিকেজি ওজনের জন্য ১৫ মিলিগ্রাম করে মেট্রোনিডাজোল ৮ ঘণ্টা পর পর ৭ দিন খাওয়াতে হবে

বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে: ৮ ঘণ্টা পর পর ৪০০ মিলিগ্রাম করে মেট্রোনিডাজোল ৭ দিন খেতে হবে

ডায়রিয়ায় জিঙ্ক-চিকিৎসা

ছয় মাস থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে: প্রতিদিন একবার ২০ মিলিগ্রাম করে ১০ দিন খাওয়াতে হবে ■

আইসিডিডিআর,বি-তে ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্প

চাই শৈ প্রু, জেকব খিয়াং, ওয়াসিফ আলী খান
আইসিডিডিআর,বি

অ্যানোফেলিস-নামক স্ত্রীজাতীয় মশাবাহিত চার ধরনের পরজীবী: প্লাজমোডিয়াম ফেলসিপেরাম, প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, প্লাজমোডিয়াম ওভাল এবং প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি মানবদেহে যে-রোগ সৃষ্টি করে তাকেই ম্যালেরিয়া বলা হয়। একসময়ে এই উপমহাদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেশি ছিলো। বেশ কয়েক দশক এর প্রাদুর্ভাব কিছুটা কম ছিলো। গত কয়েক বছর ধরে এ-অঞ্চলে ক্রমশ রোগটির পুনরাবির্ভাব ঘটছে। এমতাবস্থায়, আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি)-এর বান্দরবান ফিল্ড অফিসের কার্যক্রম বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত গবেষণা ও রোগচিহ্ননের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বান্দরবানের কুহালং ও রাজবিলা ইউনিয়নে জনসাধারণের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে জানতে আইসিডিডিআর,বি এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ একযোগে কাজ করছে।

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কতটা প্রকট, বর্তমানে কীধরনের ম্যালেরিয়া হচ্ছে, কাদের ম্যালেরিয়া বেশি হয়, কী কী কারণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় এবং সময়ের সাথে-সাথে কীভাবে ম্যালেরিয়ার ধরন পরিবর্তিত হয় এসব তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এই প্রকল্প ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং কীভাবে এর জন্য আরো উন্নত চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় সে-বিষয়ে সহায়তা করবে।

আইসিডিডিআর,বি বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সম্ভাব্য ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর প্রত্যক্ষভাবে নজর রাখছে। আনুমানিক ২০,০০০ জনসংখ্যা-অধ্যুষিত বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদর উপজেলা কুহালং এবং রাজবিলা ইউনিয়নে এই প্রকল্পটি আগামী ৩ বছরব্যাপী কাজ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আশা করা যায়, এই কার্যক্রম থেকে লব্ধ জ্ঞান এবং তথ্য আগামীতে ম্যালেরিয়া-বিষয়ক আরো নতুন গবেষণা প্রকল্প এবং কর্মসূচি তৈরিতে উৎসাহ জোগাবে।

সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সুস্থ ব্যক্তির শরীরেও ম্যালেরিয়ার জীবাণু থাকতে পারে। অথচ আমরা কেবল অসুস্থ হলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাই, সুস্থ অবস্থায় কখনো যাই না। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য এ-বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আপাত সুস্থ কিন্তু ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী ব্যক্তিগণ প্রতিবেশী সাধারণ জনতার মধ্যে অজান্তেই ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে দিতে পারে।

অনেকেই মনে করেন, মশা কেবলমাত্র রাতেই (সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত) কামড়ায়। কিন্তু আফ্রিকা অঞ্চলে ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা গেছে, মশা দিনের বেলায়ও মানুষকে কামড়ায়। বন কিংবা ঝোপঝাড়ে যারা কাজ করে তারা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং তাদেরকে কামড়িয়ে মশা যখন তাদের প্রতিবেশী লোকদেরও কামড়ায় তখন তারাও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া সংক্রমণের এই দিকটি নিয়ে এখনও কোনো গবেষণা করা হয় নি। অচিরেই সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আমাদের লক্ষ্য, যাতে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি হয় এবং জনগণ ম্যালেরিয়ামুক্ত ও সুস্থ-সবল থাকতে পারে।

আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তবে, বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে ম্যালেরিয়ার রোগতত্ত্ব, প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে এ-লেখায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হলো।

পার্বত্য জেলা বান্দরবানে আইসিডিডিআর,বি-র ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত প্রকল্প-এলাকাটি বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ, যা মশার বংশবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত অনুকূল

মানুষ কীভাবে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়

ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং মানুষকে এ-রোগে আক্রান্ত করে। পরবর্তী পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত মশার মাধ্যমে অন্য সুস্থ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত দুই সপ্তাহের মধ্যে জীবাণু প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং মশার মাধ্যমে নতুনভাবে আরো অনেক মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। একটি মশা একসাথে অনেক সুস্থ মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ঢুকিয়ে দিতে পারে।

ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ

ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান উপসর্গ জ্বর যা সারাক্ষণ বা প্রতিদিন হঠাৎ-হঠাৎ দেখা দিতে পারে। শুরুতে হঠাৎ-হঠাৎ জ্বর হয়, কিন্তু এই জ্বর ২-৩ দিন পর নিয়মিত একটা রূপ নেয়। সাধারণত বেশ কয়েক ঘণ্টা জ্বর থাকে এবং শুরুতে শরীরে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর ওঠে। জ্বর আস্তে-আস্তে বাড়তে থাকে; তারপর শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বের হয়। জ্বরের সময় রোগীর মাথা-ব্যথা, কোমড়-ব্যথা, অস্থি-সন্ধিতে ব্যথা বা সারা শরীরেই ব্যথা হতে পারে। ক্ষুধামন্দা, বমি-বমি ভাব, বমি-হওয়া এবং পাতলা পায়খানাও জ্বরের সাথে থাকতে পারে। আক্রান্ত হওয়ার পরদিনই রোগী সুস্থ বোধ করতে পারে, কিন্তু পরের দিনই আবারও একইভাবে জ্বর আসে এবং এভাবেই চলতে থাকে। চিকিৎসার ব্যবস্থা না-করলে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা না-করলে রোগ সঙ্কটাপন্ন পর্যায়ে চলে যেতে পারে।

মারাত্মক ম্যালেরিয়ার বিপদ-চিহ্ন

- উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর
- ঘন-ঘন বমি, অষুধ মুখ দিয়ে খেতে না-পারা, খাবার ও পানি খেতে না-পারা
- অকারণে নাক দিয়ে, দাঁতের মাড়ী ও অন্যান্য জায়গা দিয়ে রক্ত-পড়া
- অস্বাভাবিক আচরণ, যেমন খিঁচুনি, অচেতন-হওয়া, ঘুম-ঘুম ভাব, দ্বিধাদ্বন্দ্বে-ভোগা, প্রলাপ-বকা অথবা পরিচিতজনদের চিনতে না-পারা
- খুব সামান্য পরিমাণ গাঢ় রঙের প্রস্রাব-হওয়া; অনেক সময় প্রস্রাব একবারে বন্ধ হয়ে-যাওয়া
- শরীরে মারাত্মক পানিশূন্যতা দেখা-দেওয়া
- রক্ত-স্বল্পতা
- জন্ডিসের মতো চোখ হলুদ হয়ে-যাওয়া

ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণ

ম্যালেরিয়ার জীবাণু তিনটি পদ্ধতি দ্বারা সনাক্ত করা হয়: (১) দ্রুত সনাক্তকরণ পরীক্ষা (ফেলসিভ্যাক্স যার মাধ্যমে প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স এবং ফেলসিপেরাম উভয়কে মাঠ-পর্যায়ে সনাক্ত করা যায়), (২) স্লাইড এবং (৩) ফিল্টার পেপার। উল্লেখ্য যে, ফিল্টার পেপারের পরীক্ষাটি কেবলমাত্র ঢাকাস্থ আইসিডিডিআর,বি এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হপকিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয়। এর কারণ ডিএনএ অনুসন্ধানের এই পরীক্ষাটি মাঠ-পর্যায়ে করা সম্ভব হয় না।

মাঠ-পর্যায়ে খুব দ্রুত ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণের জন্য ফেলসিভ্যাক্স নামক পরীক্ষা-পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স এবং ফেলসিপেরাম উভয় ধরনের জীবাণুর সংক্রমণ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা

মাঠ-পর্যায়ে কোনো ব্যক্তি বা শিশু ম্যালেরিয়ার পরীক্ষায় পজিটিভ চিহ্নিত হলে পরজীবীর প্রকার অনুসারে অষুধ দেওয়া হয়। কয়েক ধরনের অষুধ এবং এগুলোর মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো।

প্লাজমোডিয়াম ফেলসিপেরামজনিত ম্যালেরিয়া হলে ট্যাবলেট কোয়ার্টাম নিম্নোক্ত মাত্রায় খাওয়ানো হয়:

৫ থেকে ১৪ কেজি ওজনবিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১+১+১+১+১+১ ট্যাবলেট

১৫ থেকে ২৪ কেজি ওজনবিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২+২+২+২+২+২ ট্যাবলেট

২৫ থেকে ৩৪ কেজি ওজনবিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৩+৩+৩+৩+৩+৩ ট্যাবলেট

৩৫ কেজির বেশি ওজনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৪+৪+৪+৪+৪+৪ ট্যাবলেট

উল্লেখ্য যে, এই অষুধের প্রথম ডোজটি রোগ নির্ণিত হওয়ার পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খাওয়াতে হবে। দ্বিতীয় ডোজটি প্রথম ডোজের ঠিক ৮ ঘণ্টা পর খাওয়াতে হবে। এর পর থেকে অন্য ডোজগুলো ১২ ঘণ্টা পরপর খাওয়াতে হবে।

সাবধানতা: কখন কোয়ার্টাম দেওয়া উচিত নয়

- যেসব রোগী কোয়ার্টামের প্রতি সংবেদনশীল
- যেসব রোগীর বৃক্ক (কিডনি) অকার্যকর
- যেসব রোগীর যকৃত (লিভার) অকার্যকর

গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রথম তিন মাস এই অষুধ দেওয়া যাবে না; তার পরিবর্তে ট্যাবলেট কুইনিন (৩০০ মি.গ্রা.) দেওয়া যাবে। সাধারণত একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য দৈনিক তিনবার করে প্রতিবার ২টি ট্যাবলেট মোট ৭ দিন খাওয়াতে হবে।

প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স-এর ক্ষেত্রে ট্যাবলেট ক্লোরোকুইন (২৫০ মি.গ্রা.) নিম্নোক্ত মাত্রায় খাওয়ানো হয়:

এই অষুধের মাত্রা সাধারণত প্রতিকেজি শারীরিক ওজনের জন্য ২৫ মি.গ্রা.। তবে, জাতীয় চিকিৎসা-বিধান অনুযায়ী আজকাল ১ম দিন প্রতিকেজি শারীরিক ওজনের জন্য ১০ মি.গ্রা., ২য় দিন প্রতিকেজি শারীরিক ওজনের জন্য ৭.৫ মি.গ্রা. এবং ৩য় দিন প্রতিকেজি শারীরিক ওজনের জন্য ৭.৫ মি.গ্রা. করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক একজন রোগীকে প্রথম দিন ৪ ট্যাবলেট, দ্বিতীয় দিন ৩ ট্যাবলেট এবং তৃতীয় দিন ৩ ট্যাবলেট একসঙ্গে দিতে হবে। চতুর্থ দিন থেকে ১টি করে ট্যাবলেট প্রিমাকুইন (১৫ মি.গ্রা.) ১৪ দিন পর্যন্ত খাওয়াতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ট্যাবলেট প্রিমাকুইন গর্ভবতী মহিলা এবং ৫ কেজির কম-ওজনের শিশুদের দেওয়া যাবে না।

গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ট্যাবলেট ক্লোরোকুইন ২৫০ মি.গ্রা. দেওয়া হয়। প্রথম দিন ৪ ট্যাবলেট, দ্বিতীয় দিন ৩ ট্যাবলেট এবং তৃতীয় দিন ৩ ট্যাবলেট একসঙ্গে খাওয়াতে হবে। তৃতীয় দিনের পর গর্ভবতী মহিলাদেরকে ম্যালেরিয়ার জন্য আর কোনো অষুধ দেওয়া হয় না।

ক্লোরোকুইনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

- বমি-বমি ভাব, বমি-হওয়া এবং ডায়রিয়া
- চোখে ঝাপসা-দেখা

ম্যালেরিয়ার জটিলতা

যথাসময়ে ফেলসিপেরাম ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা না-হলে নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। এই জটিলতার কারণে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

সাধারণত নিম্নবর্ণিত জটিলতা দেখা যায়:

- সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া অথবা মস্তিষ্কের ম্যালেরিয়া
- অকার্যকর কিডনি বা বৃক্ক
- অতিরিক্ত বমি এবং ডায়রিয়ার ফলে শরীরে মারাত্মক পানিশূন্যতা সৃষ্টি
- মারাত্মক রক্তশূন্যতা
- অকার্যকর লিভার বা যকৃতের ফলে জন্ডিস

শিশুদের ম্যালেরিয়া

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ ম্যালেরিয়া। উক্ত এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি হওয়ার জন্য শিশুরা অন্যান্য জায়গার তুলনায় ম্যালেরিয়ায় বেশি আক্রান্ত হয়। যখন শিশুরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, তখন তারা দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার পর শিশুরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেও বড়দের চেয়ে বেশি সময় নেয়। যদি তারা ঘন ঘন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, তাহলে তারা অপুষ্টিতেও আক্রান্ত হয় কেননা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তারা রুচিহীনতার কারণে পর্যাপ্ত খাবারও খেতে পারে না। শিশুরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের শারীরিক ওজনের ভিত্তিতে আগে উল্লেখিত অষুধগুলোর মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

শিশুরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে যেসব জটিলতা দেখা দিতে পারে তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

- *মস্তিষ্কে ম্যালেরিয়া*: শিশুদের মস্তিষ্কে ম্যালেরিয়া হলে তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে (অর্থাৎ অচেতন হয়ে যায়) এবং খিঁচুনি হয়। এ-অবস্থায় শিশুদের মৃত্যুও হতে পারে
- *রক্তশূন্যতা*: ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের রক্তশূন্যতা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এর কারণ ম্যালেরিয়ার জীবাণু যে-রক্তকণিকায় বাস করে তাকে ধ্বংস করে দেয়
- *কিডনি (বৃক্ক) অকেজো-হওয়া*: ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের কিডনি অকেজো হয়ে গেলে তাদের প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং আস্তে-আস্তে শরীরে পানি জমতে থাকে। শরীরে পানি জমার কারণে মুখ, হাত, পেট ও পা ফুলে যায়। এ-অবস্থায় শিশুদের মৃত্যুও হতে পারে
- *মারাত্মক পানিশূন্যতা*: শিশুরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে তাদের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। শরীরের তাপমাত্রা বাড়ার কারণে শরীর থেকে পানি বের হয়ে মারাত্মক পানিশূন্যতার সৃষ্টি করে
- *জন্ডিস*: শিশুরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে যকৃত (লিভার) ঠিকমত কাজ করে না। ফলে, জন্ডিস হয়

গর্ভকালীন সময়ে ম্যালেরিয়া

গর্ভবতী মহিলাদের ম্যালেরিয়া হলে অতি দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে কারণ এতে মা এবং গর্ভের শিশু উভয়েই মারা যেতে পারে। গর্ভবতী মহিলার ম্যালেরিয়া হলে গর্ভের শিশুর ক্ষেত্রে যেসব জটিলতা দেখা দিতে পারে তার কয়েকটি হলো:

■ গর্ভপাত ■ মৃত শিশু প্রসব ■ নির্দিষ্ট সময়ের আগে শিশুর জন্ম ■ কম ওজনের শিশুর জন্য।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত কোনো গর্ভবতী মহিলা নিম্নবর্ণিত কারণে মারা যেতে পারে:

■ মস্তিষ্কে ম্যালেরিয়া হলে ■ খিঁচুনি হলে ■ লিভার বা যকৃত অকার্যকর হয়ে গেলে ■ রোগীর অবস্থা আকস্মিকভাবে খারাপ হয়ে গেলে, যেমন তাপমাত্রা কমে-যাওয়া ■ শিরার গতি ধীর হয়ে-আসা, রক্তচাপ না-পাওয়া বা কমে-যাওয়া, রোগী নেতিয়ে-পরা।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবকালীন সময়ে নানা সমস্যা যেমন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলেও মৃত্যু ঘটতে পারে।

মশা নিয়ন্ত্রণের দুই রকম পদ্ধতি

রাসায়নিক পদ্ধতি

- বসতবাড়িতে মশার অষুধ ছিটানো
- মশার ডিম পারার স্থানে রাসায়নিক দ্রব্য ছিটানো, যাতে মশার শুককীট (লার্ভা) মারা যায়

পরিবেশগত পদ্ধতি

- কোনো গর্ত বা নিচু জায়গা যেখানে বর্ষার পানি জমে এবং যা ব্যবহৃত হয় না তা অবশ্যই মাটি দিয়ে ভরাট করা উচিত। তা না-হলে উক্ত জলাধার মশার বংশবৃদ্ধির স্থানে পরিণত হবে
- ঘরের ব্যবহৃত পানি, কলের পানি বা অন্যান্য কাজের পানি একজায়গায় জমে-জমে একেকটা ছোট ছোট স্থির জলাধার সৃষ্টি করতে পারে। এসব জায়গায় মশা বংশবৃদ্ধি করতে পারে। তাই ব্যবহৃত পানি কোথাও জমে যাতে স্থির না-থাকে বরং নালার মাধ্যমে সঠিকভাবে দূরে সরানো যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে
- ঘরের বাইরে ফেলে-রাখা অব্যবহৃত টিনের বা প্লাস্টিকের বাক্স, কৌটা, জার, নারকেলের খোল যেগুলোতে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে পারে তা অবশ্যই সরিয়ে ফেলতে হবে
- খাল বা নালার পাড়ের ঝোপজঙ্গল অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে; তাতে খাল বা নালাতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং মশার ডিম ভেসে যাওয়ায় তাদের বংশবৃদ্ধি কমে যাবে
- পানির ট্যাঙ্ক অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে

মনে রাখা দরকার, কারো একার পক্ষে পরিবেশগত পদ্ধতিতে মশার বংশবিস্তার রোধ করা সম্ভব নয়। এতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য ■

জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব

মূনীরুল আলম
খানজাদা শাহনেওয়াজ বিন মান্নান
আইসিডিডিআর,বি

ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থানের দীর্ঘদিনের গড় আবহাওয়া পরিস্থিতি, যেমন গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বাতাসের আর্দ্রতা, ইত্যাদি যেসব বিষয় সেই স্থানের নিজস্ব ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাকেই আমরা জলবায়ু বলে জানি। জলবায়ুর কারণেই একেক স্থানের আবহাওয়া একেক রকম হয়ে থাকে। কোনো স্থান হয় অতিরিক্ত শীতল, কোনো স্থান হয় উষ্ণ (গরম) কিংবা না-শীতল-না-উষ্ণ (নাতিশীতোষ্ণ)।

জলবায়ুর পরিবর্তন

জলবায়ুর পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝি আবহাওয়ার দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন। এর ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বায়ুর চাপ, বাতাসের গতি, বৃষ্টিপাত, ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই পরিবর্তন প্রাকৃতিক নিয়মে খুব ধীর গতিতে কিংবা কোনো বিশেষ কারণে অতি দ্রুতও ঘটতে পারে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণ

জলবায়ুর পরিবর্তন যেমন প্রাকৃতিক কারণে ঘটতে পারে, তেমনি আধুনিক যুগের মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের ফলেও ঘটতে পারে। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে কোনো স্থানের জলবায়ুর সাময়িক বা দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ঘটতে পারে। তবে, বর্তমানে জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে যেসব আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক চলছে এই পরিবর্তন মানবজাতির নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা সৃষ্ট। অতিমাত্রায় জ্বালানী তেল ও গ্যাসের ব্যবহার, পারমানবিক চুল্লি-সহ শিল্প-কারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত গ্রীন হাউস গ্যাসের মাধ্যমে অতি দ্রুততার সাথে জলাবায়ুর পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

গ্রীন হাউস প্রভাব কী

গ্রীন হাউস হলো কাচ বা পলিথিন দিয়ে তৈরি ঘর যেখানে নিয়ন্ত্রিত সূর্যালোক, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শীতকালে গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জি ও ফল-মূল, ইত্যাদি চাষ করা যায়। কমলার মত গোলাকার, বিশাল এই ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ যেখানে আমরা প্রাকৃতিকভাবে শাক-সব্জি, গাছপালা জন্মাতে দেখি তা-ও পরোক্ষ অর্থে একটি প্রাকৃতিক গ্রীন হাউস। ভূ-পৃষ্ঠে আমাদের চারপাশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় সূর্যের আলো ও বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে জমে-থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ বিভিন্ন গ্রীন হাউস গ্যাসের সূর্যতাপ ধারণ করে রাখার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সূর্যরশ্মি বিভিন্ন বায়ুস্তর ভেদ করে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবেশ করে, কিন্তু বেশিরভাগই বিকিরিত হয়ে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। বায়ুস্তরে জমা-হওয়া গ্রীন হাউস গ্যাস প্রাকৃতিকভাবে ভূ-পৃষ্ঠকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক নিয়মে গ্রীন হাউস গ্যাস প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকার কথা। কিন্তু মানুষের আধুনিক জীবন যাপনের জন্য ভূ-গর্ভস্থ গ্যাস, তেল, কয়লা, ইত্যাদি উত্তোলন ও পোড়ানোর মাধ্যমে গ্রীন হাউস গ্যাস আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। তাছাড়া,

ইটের ভাটা, কল-কারখানা ও যানবাহনের কালো ধুঁয়া জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখছে (*ছবি: আসেম আনসারী*)

পৃথিবীর জনসংখ্যা অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সবুজ গাছপালা ও বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণকারী সবুজ গাছপালাও দিনদিন কমে যাচ্ছে। তাই গ্রীন হাউস গ্যাস তথা কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথিবীর আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলছে। আধুনিক মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট জলবায়ুর পরিবর্তন (উষ্ণায়ন)-বিষয়ক আলাপ-আলোচনায় আমরা এই প্রক্রিয়াকে 'গ্রীন হাউজ ইফেক্ট' বা 'গ্রীন হাউজ প্রভাব' বলে থাকি।

ওজোন স্তর এবং এর ক্ষয়

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে প্রায় ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের স্তরকে ট্রপোস্ফিয়ার বলা হয়। তার পরবর্তী বায়ুস্তরের নাম স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিম্নভাগে অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের ১৩ থেকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ওজোন নামক একটি উপকারী গ্যাসের স্তর। ওজোন গ্যাস তিনটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে তৈরি। প্রাকৃতিকভাবে এই ওজোন স্তর সূর্যের আলোতে বিদ্যমান ক্ষতিকর কিছু আলোকরশ্মি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে থাকে। সূর্যালোকে বিদ্যমান অতিবেগুনী রশ্মি মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই আলোকরশ্মি পৃথিবীতে আসার পথে ওজোন স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে, ভূ-পৃষ্ঠে এসব ক্ষতিকর আলোকরশ্মি খুব কমই এসে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু রেফ্রিজারেশনসহ অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি থেকে নির্গত ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বা সংক্ষেপে সিএফসি গ্যাস ওজোন স্তরকে ক্ষয় করে চলেছে। সিএফসি থেকে নির্গত ক্লোরিন পরমাণু ওজোনের সাথে বিক্রিয়া ক'রে ক্রমাগত ওজোন স্তরকে দুর্বল করে দিচ্ছে। ফলে, সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে অতিমাত্রায় এসে পৌঁছাচ্ছে এবং তাপমাত্রাকে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতে সাহায্য করছে। ওজোন স্তরের ক্রমাগত ক্ষয়ের কারণে পৃথিবীতে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির অবাধ অনুপ্রবেশ ও তার বিরূপ প্রভাব আমাদের ত্বক ও চোখের ক্যান্সার সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে; ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে; এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে নতুন-নতুন মরু অঞ্চল তৈরি হচ্ছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে হিমবাহ গলতে শুরু করেছে যা বড় রকমের বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। চিত্রে গঙ্গোত্রী হিমবাহের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর মেরু-অঞ্চলে লক্ষ-কোটি বছর ধরে পর্বতশৃঙ্গে জমে-থাকা বিশাল বরফের চাঁইসমূহ ধীরে-ধীরে গলতে আরম্ভ করেছে। এতে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে চলেছে। ফলে, তলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে সমুদ্র-তীরবর্তী নিচু অনেক দেশ।

এই ভয়াবহ অবস্থায় ফসলী-জমি সমুদ্রের লোনা পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে খরায় মরুকরণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনেক সবুজ এলাকা ধূসর মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে চৌদ্দ কোটি মানুষ বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ধ্বংসযজ্ঞের এক নির্মম শিকার হতে চলেছে। ইতোমধ্যেই জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বন্যা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও খরার মতো ঘটনা ঘটছে। এছাড়াও, সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে-সাথে সাগরের লোনাজল উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবেশের ফলে ফসলী-জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ছে।

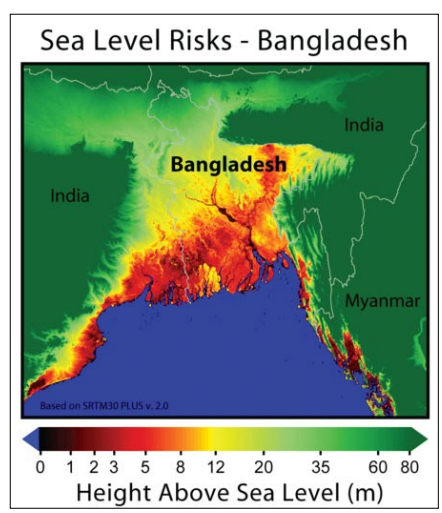

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের এক বিরাট অংশ পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে

জাতিসংঘের ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অব ক্লাইমেট চেইঞ্জ (আইপিসিসি)-এর মতে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে-সাথে বাংলাদেশের অন্তত ১৭ ভাগ ভূমি তলিয়ে যাবে। এতে ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্র-তীরবর্তী ৫ কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে যেতে পারে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে প্রতিবছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগ আগের তুলনায় ইতোমধ্যেই অনেক বেড়ে গেছে। এতে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এত বড় ক্ষতি বাংলাদেশের মানুষকে মেনে নিতে হবে। অথচ এর জন্য বাংলাদেশ দায়ী নয়, এর জন্য দায়ী শিল্পোন্নত পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলো। এই বিপর্যয় আপাতদৃষ্টিতে প্রাকৃতিক হলেও তা পশ্চিমা বিশ্বের লাগামহীন শিল্পায়নের ফলে ঘটে চলেছে। তাই বাংলাদেশের উচিত পশ্চিমা বিশ্বকে এর ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করা।

জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সংক্রামক রোগ

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন হওয়ায় ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, কালাজ্বর ও কলেরার মতো সংক্রামক রোগের সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যার কারণে বিশুদ্ধ পানির অভাবে বেড়ে চলেছে কলেরা ও ডায়রিয়ার মতো পানিবাহিত রোগের সংক্রমণ। আরো অনেক অজানা স্বাস্থ্যসমস্যা অপেক্ষা করছে, যা বাংলাদেশের মতো গরিব দেশের পক্ষে সামাল দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে।

কৃষি-উৎপাদনে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ুর পরিবর্তন কৃষি-উৎপাদনের ওপরও মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ও ফসলী-জমির লবণাক্ততা পরিবর্তনের জন্য কৃষি-উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নতুন-নতুন এলাকায় মরুকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে। এতে মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশই নিচে চলে যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে শুধু বাংলাদেশই নয়, সমগ্র মানবজাতি আজ এক অভাবনীয় অবস্থার দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

পরিত্রাণের উপায়

কল-কারখানা ও যানবাহন থেকে অধিক মাত্রায় কার্বন নির্গমণ হ্রাস করা না-গেলে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এই পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া এক-কথায় অসম্ভব। বাংলাদেশে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরী ভিত্তিতে আমরা যা করতে পারি তা হলো: অতিরিক্ত জনসংখ্যা হ্রাস করে একটি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা। তা না-হলে অদূর ভবিষ্যতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া, সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে উঁচু বাঁধ তৈরি-করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। বাঁধ দিয়ে সমুদ্র-তীরবর্তী নিচু কৃষি-জমিকে চাষের আওতায় রাখতে হবে। চাঁদপুরের মেঘনা-ধনাগোদা বাঁধ এই ব্যবস্থার একটি সুন্দর উদাহরণ। সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষিকাজের সঙ্গে-সঙ্গে জনগণকে শিল্প ও কারিগরি কাজের দক্ষতা বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ-অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। তবে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলে সবকিছুই ভেস্তে যাবে এবং এ-দেশকে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হতে হবে। তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে সচেতনভাবে এর মোকাবিলা করি ■

স্বাস্থ্যসমস্যায় তুলসীর উপকারিতা

মনোয়ার জাহান
আইসিডিডিআর,বি

পৃথিবীতে যত রকম ভেষজ উদ্ভিদ আছে তুলসী এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে তুলসীকে অমৃততূল্য মনে করেন। তুলসী বিশ্বের একমাত্র গাছ যা মানুষের প্রায় সব ধরনের রোগ সারাতে পারে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন তুলসীর তেল অনেক রকমের জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। তুলসীপাতা, এর বীজ ও ছাল যেসব স্বাস্থ্যসমস্যার উপশম করতে পারে তার কয়েকটি এ-লেখায় তুলে ধরা হলো।

কাশি

যদি খুসখুসে কাশি হয়, তাহলে তুলসীপাতা, আদা ও পেঁয়াজ একসঙ্গে সমমাত্রায় মিশিয়ে পরিষ্কার শীল-পাটায় বা অন্য কোনো শক্ত পাত্রে বেটে এগুলোর রস বার করে নিন। এই রসের সাথে মধু মিশিয়ে দিনে ৩/৪ বার ১ চামচ করে খেলে কাশি সেরে যায়। যদি কাশির সাথে কফ বেরোয়, তাহলে তুলসীপাতা মিছরির সঙ্গে মিশিয়ে পরিষ্কার শীল-পাটায় বা অন্য কোনো শক্ত পাত্রে বেটে নিন। এর সঙ্গে ৫ গ্রাম পানি মিশিয়ে তার ভাপ নিন। বুকে-জমা সর্দি বেরিয়ে যাবে।

গলা-বসা

যদি সর্দিগর্মির কারণে গলা বসে যায়, তাহলে তুলসীপাতা, আদা ও পেঁয়াজ বেটে রস করে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খান। সকাল-বিকাল দু'বেলা খেলে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হয়ে যায়।

গলা-ব্যথা

উচ্চস্বরে কথা-বলা অথবা গান গাইবার জন্য অনেকসময় গলায় ব্যথা হয়। এক্ষেত্রে, তুলসীপাতার রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে মোটামুটি ২-৩ বার খেলেই গলা-ব্যথা সেরে যায়।

মাথা-ঘোরা

মস্তিষ্কের দুর্বলতার জন্যই সাধারণত মাথা ঘোরে। মধু মিশিয়ে কিছুদিন তুলসীপাতা খেলে মস্তিষ্কের দুর্বলতা দূর হয় এবং মাথা-ঘোরাও বন্ধ হয়ে যায়। তবে, এতে কাজ না-হলে বুঝতে হবে উচ্চ রক্তচাপ বা অন্য কোনো কারণে এ-সমস্য দেখা দিয়েছে। এ-অবস্থায় দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

চর্মরোগ

দাদ ও চুলকানি হলে তুলসীপাতা, তুলসীগাছের ছাল ও বীজ ছায়ায় শুকিয়ে অল্প গুঁড়া করে লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগান। তাহলে চর্মরোগ সেরে যাবে।

খুসকি

তুলসীপাতার রস ও লেবুর রস মিশিয়ে ঘষে-ঘষে মাথায় লাগান। তাহলে খুসকি দূর হয়ে যাবে এবং মাথার চুলকানি বন্ধ হয়ে যাবে।

সর্দি

৬ গ্রাম তাজা তুলসীপাতা, ৬ গ্রাম শুকনা আদা ও ৬ গ্রাম ছোট এলাচ ১ গ্রাম দারুচিনির সাথে গুঁড়া করে চায়ের মত ফুটিয়ে নিন। অল্প চিনি মিশিয়ে এই পানীয় দিনে চারবার খেলে যেকোনো রকম সর্দিই ভালো হয়ে যাবে।

উকুন

তুলসীপাতার রসে লেবুর রস মিশিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। আঙুলের ডগায় নিয়ে রগড়ে-রগড়ে মাথায় লাগান। আধা ঘণ্টা পর পানি দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলুন। এতেই সমস্ত উকুন মরে যাবে।

ক্লান্তি

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লে তুলসীপাতা দিয়ে চা তৈরি করে খান; ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

টক ঢেঁকুর

খাওয়ার কিছুক্ষণ আগে ৫-৬টি তুলসীপাতা টুকরো করে সামান্য পানিতে ভিজিয়ে রেখে সেই পানি পান করলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায় ও টক ঢেঁকুর-ওঠা বন্ধ হয়ে যায়।

নাকের ফুসকুড়ি

তুলসীপাতার রস কর্পূরের সঙ্গে মিশিয়ে নাকের ফুসকুড়িতে লাগান, তাহলে ফুসকুড়ি সেরে যাবে।

চুল-পড়া

২০-২৫টি তুলসীপাতা ১০ গ্রাম আমলকির সঙ্গে চূর্ণ করে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। আধা ঘণ্টা পর সেই পানি মাথায় ভালো করে ঢালুন যাতে চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছায়। পানি শুকিয়ে গেলে মাথা ধুয়ে ভালো করে নারকেল তেল লাগান। এতে চুল-পড়া বন্ধ হয়ে যায়, যদি তা অন্য কোনো জটিল রোগের উপসর্গ না-হয়ে থাকে।

ব্রণ

তুলসীপাতার রস ও লেবুর রস একত্রে মিশিয়ে দিনে ৩/৪ বার মুখের ব্রণে লাগালে ব্রণ দূর হবে এবং মুখের চামড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

অরুচি

কখনো কখনো ক্ষিদে পেলেও খেতে ইচ্ছা করে না। যেকোনো খাদ্যের প্রতি অরুচি জন্মে। তুলসীর বীজ ও পাতা সমপরিমাণে নিয়ে ভালো করে গুঁড়া করে এর ৩ গ্রাম অল্প মধুর সঙ্গে মিশিয়ে দু'চারদিন খান; খাবার-দাবারে অরুচি সেরে যাবে।

আঙুলহাড়া

আঙুলের মাথায় (ডগায়) ফোঁড়া হলে তাকে আঙুলহাড়া রোগ বলা হয়। তুলসীপাতার রসে কয়েকটি লবঙ্গ ঘষে নিয়ে সেটা আক্রান্ত স্থানে দু'চারদিন লাগালে দ্রুত আঙুলহাড়া রোগ সেরে যাবে ■

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তুলসীর উপরোক্ত ভেষজ গুণাগুণ সম্পর্কে বলা হলো। এসব স্বাস্থ্যসমস্যায় তুলসীর কার্যকারিতা বিলম্বিত হলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে; বুঝতে হবে সমস্যাটি কোনো জটিল রোগের উপসর্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে।